সম্পাদকীয়

মহান ভাষা আন্দোলনের ভাষা শহীদ, ভাষা সৈনিকদের প্রতি আমাদের সীমাহীন শ্রদ্ধা। আমরা প্রবাসে ভিন্নভাষা সংস্কৃতির মাঝে অবগাহন করেও বাঙলা ভাষা সাহিত্যের চর্চা করি। নিরস মরুতে করি সরস পলাশের চাষ। বলা যায় এখানে আমরা বিরুদ্ধ স্রোতের যাত্রী। তবুও প্রাণের তাগিদে নিজ ভাষা সাহিত্যের প্রতি গভীর মমত্ববোধই আমাদের এই চর্চাকে আজও টিকিয়ে রেখেছে। এখানে আমাদের বাঙালি ভাইদের অনেকগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যাতে রয়েছে তিন ভাষার সাইনবোর্ড। আরবী ইংরেজী এবং বাংলা। অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আরবী এবং বাংলা। তবে বাংলা সাইনবোর্ডগুলোর বাংলা বানান দেখলে ভিরমি খেতে হয়। এরা কেউই সচেতন নয়।

এদেশের সিস্টেমের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, এখানে একুশ আসে অতি নিরবে নিভৃতে। বিদেশে বাংলা মিশনগুলোতেও একই অবস্থা। আমরা যারা লেখক জীবন এবং জীবিকার কাছে আটকা পড়ে প্রবাসী। এদিনগুলোতে আমরা কিছু শব্দমালা দিয়ে ভাষা শহীদদের সম্মান ও স্মরণ করে থাকি।

সউদী প্রবাসীদের প্রধান কিছু সমস্যা এবং চাওয়া পাওয়া নিয়ে আমি গত সম্পাদকীয়র একটি অংশ দৈনিক যুগান্তরে দিয়েছিলাম। দৈনিক যুগান্তর তা ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ইং সংখ্যায় প্রকাশ করে আমাদের ১৫ লক্ষাধিক সউদী প্রবাসীর কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন। সুপ্রিয় পাঠকবন্ধুগন যারা সেই যুগান্তরের প্রকাশিত অংশটুকু পড়তে চান, তারা বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকের কলাম নামক আইকনটি ক্লিক করুন। এবারের একুশের আইকনটি এঁকেছেন সাইফ মুন্না।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০৭ মরুপলাশ এর এই বিশেষ প্রকাশনায় যারা তাদের লেখা, মেধা মনন দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তাদেরকে মহান একুশের শুভেচ্ছা। তাঁরা হলেন-সুদূর বাংলাদেশ থেকে পিযুশ কান্তি রায় চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌঃ দেলোয়ার হোসেন, নুরুন্নাহার মুন্নি, মোহসিনা বেগম, সাইফ মুন্না এবং শেষান্তে রয়েছে আমার কয়েকটি ভাষার ছড়া।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক

২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ইং
৯ই ফাল্গুন ১৪১৩বাঙলা।
রিয়াদ, সউদী আরব।

“ভাষা আন্দোলন” এক গৌরব উজ্জল ইতিহাস এবং চেতনা

সাইফ মুন্না

১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত ফেব্রুয়ারী মাসের সঙ্গে এই বাংলাদেশ নামক ভুখন্ডের মানুষের আবেগের সম্পর্ক অনেক বেশী। বাহান্ন আর একুশ আজ দুটি শব্দ নয়, এগুলো বাংলাদেশের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের পর পার হয়েছে ৫৫টি বছর। আজো সেই তারিখ দেশবাসির চেতনায় এক একটি মশাল। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারী মাস আমাদের সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শানিত করে দিয়ে যায় আমাদের চেতনাকে।

স্মরন করিয়ে দিয়ে যায় ভাষা সংগ্রামীদের মহান আত্নত্যাগের কথা।ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই এই চুড়ান্ত লগ্নটি একদিনে বা কয়েকটি মাত্র দিনের পরিশ্রমের ফসল নয়, বরং এর পেছনেও সামগ্রিক একটা প্রচেষ্টা এমনি-এমনি শুরু হয়নি, তারও রয়েছে সংগ্রামী পটভূমি। সেই ইতিহাস বাংলাভাষার ইতিহাসের অংশ, একই সংগে তা স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের অংশ।

মানুষ তার মনের ভাব সম্পুর্নরূপে প্রকাশ করার জন্য যে জিনিসের প্রয়োজন তা হচ্ছে ভাষা। এ ভাষাটা প্রত্যেক জাতী আলাদা-আলাদা ভাবে পেয়েছে পৈতৃক সম্পত্তির মত করে উত্তরাধিকার সুত্রে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী জাতীর, যারা এটাকে পৈতৃক সম্পত্তিতো নয়ই, বরং হিংশ্র হায়েনা বা জানোয়ারের মত আরেকটা জাতীর কাছ থেকে আন্দোলন, সংগ্রাম, আর রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে হয়েছে, প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে।

তামাম দুনিয়াতে আর কোন জাতি নেই যারা ভাষার জন্য আন্দোলন করেছে! রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে! যারা ভাষার জন্য প্রান দিয়েছে! বর্তমান সভ্য সমাজে কথাটা কেমন যেন হাস্য-রসে পরিনত হয়েছে। কারন, নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে দেওয়া হবেনা এ কেমন কথা, এ কেমন বর্বরতা! সাম্রাজ্য নিয়ে বিবাদ ছিল, আছে এবং থাকবে, কিন্তু মাতৃভাষা নিয়ে বিবাদ! এ নির্মম বর্বরতার স্বিকার বাঙালীরা।

সারা বিশ্বে কতগুলো ভাষা আছে তার সঠিক পরিসংখ্যান দেওয়া কঠিন হলেও, চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলে দেখা যায় যে, একটা দেশের বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যে ব্যবহার হচ্ছে একাধিক ভাষা, যা মুল রাষ্ট্রীয় ভাষা থেকে সম্পুর্ন আলাদা। আবার এমনও দেখা গেছে যে, ঐ ভাষা-ভাষী সম্প্রদায় তাদের মুল রাষ্ট্রীয় ভাষা বলতে পাওে না বা জানে না।

আমি যখন ছাত্র ছিলাম **(কলেজ জীবনে)** তখন আমার সাথে ক'জন উপজাতি ছাত্র ছিল আমার সহপাঠি, আমাদের ক্লাস শুরু হওয়ার পরে নতুন পরিবেশের কারনে কিছুদিন সময় লেগেছিল ঐ উপজাতী সহপাঠীদের সাথে অন্তরঙ্গা হতে, ঐ সময়টায় যখন তারা **(উপজাতীরা)** মিলে কথা বলত, আমি এবং যারা নতুন করে উপজাতিদের সাথে পরিচিত হতে যাচ্ছে তাদের সবাই উপজাতী সহপাঠীদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, অন্যরকম এক অনুভূতি নিয়ে, এর কিছু দিন পর আমার সাথে প্রথম যে উপজাতী সহপাঠীর সাথে কথা হয় তার নাম **"নিটোল খীসা"**।

তবে এখানে বলে রাখা দরকার যে, তারা কিন্তু বাংলা ভাষাতেই তাদের পাঠ্যক্রম চালাত, এবং তাদেরও মাতৃভাষা বাংলা। শুধুমাত্র তারা **(উপজাতীরা)** যখন মিলিত হত তখন তাদের উপজাতীয় ভাষা ব্যবহার করত। আমার ঐ উপজাতী বন্ধুটিকে একদিন যখন বললাম, তোরা যখন তোদের ভাষায় কথা বলিস তখন তাকিয়ে থাকি, আমি বা আমরা যারা নতুন করে তোদের সাথে পরিচিত হতে যাচ্ছি, ও শুনে, হেসে একাকার, ওর হাসির কারন হচ্ছে ওরা কিন্তু আমাদের সাথে দেখা হওয়ার আগে বাংগালীদের সাথেই লেখা পড়া করেছে, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক।

ওদের বেলায় আমারা নতুন কিছুনা, কিন্তু আমাদের বেলায় ওরা নতুন, আবার ও আমাকে বলল যে, তোরাওতো তোদের আঞ্চলিক ভাষাতেই কথা বলিস অনেক সময়, এটা আমরাও লক্ষ্য করে থাকি এবং অবাক হয়ে যাই অনেক সময়, কিছু বুঝতে না পারার কারনে। এখানে আমাদের যত প্রার্থক্যই থাকনা, কিন্তু মূল বিষয়ে আমরা সবাই এক। আমাদের মাতৃ ভাষা বাংলা এবং আমরা বাংলাদেশী। আমাদের মধ্যে সমান দেশপ্রেম এবং মাতৃভাষা বাংলার জন্য সমান শ্রদ্ধাবোধ।

আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের মাতৃভাষা হিন্দি, যা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত, কিন্তু ভারতের কয়েকটা প্রদেশ আছে (যে সমস্ত প্রদেশগুলো আয়তনে বাংলাদেশের চাইতেও বড়) সে সমস্ত প্রদেশের বসবাসকারী জনগোষ্ঠির একটা বড় অংশ হিন্দি ভাষা জানেনা মোটেও। এতকিছু সত্ত্বেও কোন দেশে বা কোন রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি যে, প্রাদেশিক ভাষা পরিহার করে রাষ্ট্রীয় স্বিকৃতি পাওয়া ভাষাকে বাধ্যগত ব্যবহার করতে হবে বা মেনে চলতে হবে।

একটা বিষয় এখানে পরিষ্কার, তা হল, মাতৃভাষা ছাড়া নতুন কোন ভাষা যদি কানে আসে তা কৌতূহল সৃষ্টি করে অবশ্যই। কিন্তু ঐ ভাষা যদি পড়তে, লিখতে এবং বলতে বলা হয় তাহলে মাথার মধ্যে আকাশ ভেঙ্গো পড়ার মত আর কানের ভিতর বজ্রপাতের মত আওয়াজ হয়। আর সে কাজটাই করতে চেয়েছিল পাকিস্তানিরা তাদের মাতৃভাষা উর্দুকে আমাদের মাতৃভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। আর সব চাইতে বড় জিনিস হচ্ছে, মাতৃভাষা পরিহার করে অন্যভাষা ব্যবহারে বাধ্য করা, বিরাট একটা অন্যায় কাজ।

যা আমরা বাংঙ্গালীরা ছাড়া আর কোন দেশ বা জাতি এমন অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারবেনা। একমাত্র আমাদের জাতীয় জীবনে এমন দুর্যোগ দেখতে পেয়েছি যা একটা লজ্জাকর এবং ঘৃনিত ইতিহাস এবং সেই সাথে অনেক বড় গৌরবের ইতিহাস, কারনঃ আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলার জন্য বুকের তাজা রক্ত দিয়েছি। আমাদেরকে আমাদের মাতৃভাষা আদায়ের সংগ্রাম থেকে পিছু হটাতে পারেনি এবং আমরা কোন আপোষ করিনি ভাষার প্রশ্নে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ভারতবর্ষ খন্ডিত হয়ে পাকিস্তান এবং শুধু ভারত নাম ধারন করে দুটো দেশে পরিনত হয়। তখন বাংলাদেশ দুর্ভাগ্যজনক ভাবে পাকিস্তানের সাথে পাকিস্তানের একটা অংগ রাজ্যে পরিনত হয়ে থাকে যা পরে পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারন করে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত ছিল। এই ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত সময়টা ছিল বাঙালী জাতীর জীবনে সব চাইতে বড় ক্রান্তিকাল। এই সময়ের মধ্যে জাতীকে দিতে হয়েছে অনেক রক্ত, অনেক ত্যাগ, তীতিক্ষা, আন্দোলন, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের একটা আলাদা ভাষা, এবং আলাদা একটা জাতী হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছি।

আমাদেরকে সর্ব প্রথম যে আন্দোলন করতে বাধ্য করা হয়েছে তা আমাদের মায়ের ভাষা বাংলার জন্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র ৭ মাস পর ১৯৪৮ সালে প্রথম বিরোধ দেখা দেয় ভাষার প্রশ্নে। ২১ শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রি কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঘোষনা দিয়েছিলেন, Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan "উর্দু-একমাত্র উর্দুই হবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"। ঠিক তখনই প্রতিবাদ করা হয়েছিল উপস্থিত ছাত্রদের মধ্য থেকে। মানিনা, মানিনা। পরে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে আন্দোলন সংগ্রামের বিভিন্ন কর্মসূচি দেওয়া হয়। এ সমস্ত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ধীরে-ধীরে এ আন্দোলনের গতি প্রবল বেগবান এবং শক্তিশালী করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারীর আগে ১২ই ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল, ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা যখন ঢাকার রাজপথে মিছিল করতে লাগল **"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, মানতে হবে, মানতে হবে"**।

তখন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের মিছিলে গুলি বর্ষন করতে থাকে। সেই গুলিতে শহীদ হন-সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর, জব্বার। সেদিন তারা তাদের বুকের তাজা রক্তদিয়ে আমাদের মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। রেখে গেছেন আমাদের জন্য এক শ্রুতি মধুর ভাষা।

আজ ভাষা আন্দোলনের ৫৫ বছর অতিবাহীত। এই ৫৫ বছরে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী নিয়ে লাখো গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া লিখেছেন আমাদের দেশের খ্যাতিমান দেশ বরেন্য লেখক, কবি, সাহিত্যিক, ছড়াকাররা। তারা তাদের এ লেখার মাধ্যমে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং এ ধারা এখনো

অব্যাহত রেখেছেন। আজ ভাষা আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে আছে বাংলা একাডেমী এবং বাংলা একাডেমী আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা।

একুশের স্মৃতিবাহী ফেব্রুয়ারী মাস জুড়ে এই মেলা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি অর্জনে পালন করছে এক যুগান্তকারী ভূমিকা। একুশের এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বাংলাকে শিক্ষার বাহন করা। বিভিন্ন বিষয়ে অজস্র বই প্রকাশিত হওয়ায় সেই লক্ষ্য অনেক খানি অর্জিত হয়েছে। এই মেলাকে ঘিরে প্রতিবছর প্রকাশিত হচ্ছে নানা বিষয়ে শত শত বাংলা বই। এটি একুশের একটি বড় অর্জন।

এই ৫৫ বছরে আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি অনেক খানি, আন্তর্জাতিক ভাবে বাংলাভাষার স্থান অষ্টম, আর ২১শে ফেব্রুয়ারী এখন শুধু বাংলাদেশ, বাঙালী বা বাংলা ভাষাভাষীদের গর্বের বিষয় নয়, দিনটি এখন বিশ্ববাসীর। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের প্রস্তাব, এবং সেই প্রস্তাবে অনেকগুলো দেশের সমর্থনের মধ্যদিয়ে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো দিবসটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বিকৃতি দেয়। তখন থেকে দিবসটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা নিয়ে পালিত হচ্ছে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও।

ভাষা আন্দোলনের ৫৫ বছরের আমাদের যে অর্জন তার সাথে আমাদের আরো অনেক কিছু যোগ করতে হবে বা যোগ করা দরকার, যাতে করে আমাদের এই গৌরব গাঁথা চেতনা আরো শক্তিশালী এবং আরো বেগবান হয়ে বাঙালী জাতীকে নিয়ে যেতে পারে উন্নতির নতুন দিগন্তে। এবং দিতে পারে একটি স্বচ্ছ, দুর্নীতি মুক্ত, সকল শ্রেনী, পেশার জনগনের বসবাস যোগ্য একটি সমাজ ব্যবস্থা।

যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই বিশাল অর্জন তাদের প্রতি জানাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এবং সকল ভাষা সৈনিক (যারা জীবিত আছেন) তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা রইল। শহীদ স্মৃতি অমর হোক, অমর হোক ২১শে ফেব্রুয়ারী।

সাইফ মুন্না
বিভাগীয় সম্পাদক
মরুপলাশ/রিয়াদ, সউদী আরব
waoo_bd@yahoo.com

২১ ফেব্রুয়ারী তোমার স্মরণ করি।

পিযুশ কান্তি রায় চৌধুরী

বাংলা ভাষার আদি উৎস সন্ধানে আমাদের সংস্কৃত ভাষার সাহায়তা নিতে হয়।

চন্ডিদাসের শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন (মধ্য যু গ১২০১৮০০খ্রিঃ)
কে না বাঁশি বাত্র বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশি বাত্র বড়ায়ি এ গোঠ গোকুল॥
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শব্দে মো আউলাইলো রান্ধন॥

এর সাথে শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা, বিজয় গুপ্ত, কানা হরিদত্ত, মুকুন্দরাম, ভারত চন্দ্র প্রমুখের মঙ্গাল কাব্য সমূহ। জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, চন্ডীদাস, বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলী এ যুগের নিদর্শন।

কালক্রমে এই আধুনিক যুগে (১৮০০ অদ্যাবিধ) বাংলা ভাষা বহুমুখী বিকাশ লাভ করে। বাংলাভাষা বিশ্বাবাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। স্মরণ করতে হয় রাম মোহন রায়, বিদ্যাসাগর, মধুসুদন, বঙ্কিম চন্দ্র, মীর মোশারফ হোসেন, ড. মোহাম্মদ শহীদুলাহ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র এ যুগের নির্মাতা সাহিত্য পুরুষ। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আত্মত্যাগি ভাই সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক, শফিউর ও নাম না জানা বাংলার সন্তান তাদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারী ৮-৯ ফাল্গুন আমরা গেয়ে যাই- আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি...।

বিশ্বের বুকে অন্য কোন দেশবাসী স্বীয় মাতৃভাষার জন্য আত্ম-দান করেনি। একমাত্র বাংলাদেশ শোকও আনন্দে মর্যাদার সাথে স্মরণ করছে। নিজ ভাষা মাতৃভাষা বাংলা সর্বস্তরে ব্যবহারে এখনো সুফল পাওয়া যায়নি। বিশ্বের ১৮৮টি রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয়ভাবে ভাষার তালিকায় আন্তর্জাতিক স্বিকৃতি দিয়েছে। এটা বাঙ্গালী বাংলাদেশীদের পরম পাওয়া।

এই আত্মত্যাগের পিছনে ইতিহাস আজো কথা বলে। ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিমলীগ অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। দ্বিজাতিতত্বে অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক মনোভাব ভারত বর্ষকে দ্বিখন্ডিত করা। মাহত্মা গান্ধী ভারতকে বিভক্ত করতে রাজি ছিলেন না। এর ফলশ্রুতিতে দাঙ্গা বেঁধে যায়। তখন কবির কথায় গান ছিল- তেলের শিশি ভাঙ্গাবে বলে ভারত ভাঙ্গাবে কার বেলায়- ইংরেজ শাসন তাদের লুণ্ঠন, অত্যাচর নির্যাতনতো লেগেই আছে। অসহযোগ আন্দোলন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। কত ভারতবাসী আত্মাহুতি দিয়েছে। জেল খেটেছে তার হিসেব নেই। বিনয়, বাদল, দিনেশ, সুর্যসেন প্রমুখের কথা ভুলা যায়না।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষুদিরামকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। দ্বিপান্তর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে ভারত সন্তান অভিরামকে ইংরেজদের কুটচালে বন্দি হয়ে যায়, সময়টা ১৯৪০ কে বলা যায়। লর্ড মাউন্ট বেটেন পাওয়েল আর ভারতকে শাসন করতে পারলেন না। ১৯৪৭ সালে ভবিষ্যতে যাতে সংঘাট ঘটে হিন্দু-মুসলিমদের মাঝে তার ব্যবস্থায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও জওহরলাল নেহেরুকে দিলেন পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র। ১৯৪৭ সাল ১৪ আগস্ট ও ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার পতাকা উড়ল। ইংরেজ এ দেশ থেকে চির বিদায় নিল। ২০০ বছরের গোলামীর জিঞ্জির ভেঙ্গে গেল।

এবার পাকিস্তানিরা উর্দ্দু ভাষা ভাষি পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলা ভাষাভাষি বাঙালীদের নিয়ে দুই টি প্রদেশ শাসন করতে লাগলো। উর্দু ভাষী তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে প্রথেমেই আঘাত করলো ভাষার উপর। রাষ্ট্রীয় ভাষা হবে উর্দু। কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙ্গালী তা হতে দিবে না। বাংলা হবে রাষ্ট্রীয় ভাষা ডাঃ মুহম্মদ মহীদুলাহ্ ধীরেন দত্ত এ দাবীর বিরোধীতা করেন। পরবর্তীতে বাংলার স্বাধীনচেতা ছাত্র- জনতা আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দৃঢ় চেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তানে) এসে ঢাকার রেইস কোর্স ময়দানে ও কার্জন হলে ছাত্র সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ১৯৪৮ সালে এক ভাষণে বলেন - উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা। এই সিদ্ধান্ত বাংলার জাগ্রত জনতা মেনে নিতে পারেনি। প্রতিবাদের কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠে। এই হটকারী সিন্ধান্ত থেমে থাকেনি

১৯৪৯ লিয়াকত আলী, ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারী খাজা নাজিম উদ্দিন উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষার পক্ষে জোড়ালো বক্তব্য দিয়ে থাকেন। ছাত্র সমাজ প্রতিবাদ জানায়। কাজী গোলাম মাহবুব, মৌলানা ভাসানী, গাজীউল হক, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, শেখ মুজিব, এ.কে ফজলুল হক, আব্দুল লতিফ, আতিকুল ইসলাম প্রমুখ বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে নির্যাতন, জেলা জুলুম অত্যাচারের স্বিকার হন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে ও এই নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। অনেক ছাত্র-রাজনীতিক নেতাদের। আন্দোলনের দাবানল সাড়া পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়েছিল। মিছিল, মিটিং, ধর্মঘট, বিক্ষোভ দেখিয়েছে বাঙালীরা।

গুলি খেয়েছে, পুলিশের বুটের আঘাত পেয়েছে। তবু পিছু হটেনি। মাতৃভাষা মধুর ভাষাকে অবশেষে বাঙালীরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এই ভাষা আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে স্বাধীকার আন্দোলন এসে যায়। পাকিস্তান থেকে আলাদা রাষ্ট্র বাংলাদেশ করতে গিয়ে মুক্তি যুদ্ধ করতে হয়েছে যার নেতৃত্বে ছিল বাংলার অবিসংবাদীত নেতা জাতীর জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব। অবশেষে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হল। বাংলাভাষার পূর্ণাঙ্গা রূপ দিতে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলল। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীতে যারা ভাষার জন্য আত্মত্যাগ করলো তাদের স্মরণে সরকারি ছুটি ও অমর একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস পালিত হতে লাগলো। আজ স্বাধীনতার ৩৫ বছরের মধ্যে আর্ন্তজাতিক ভাষা তালিকায় বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পেল। সর্বস্তরে মাতৃভাষা ব্যবহার এখনো চালু করা যায় নি। এটাই স্বদেশ প্রেমিদের আক্ষেপ। আশা করি শান্তির দুত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালত থেকে নিম্ন পর্যায়ের অফিস প্রশাসন পর্যন্ত মাতৃভাষা বাংলা ব্যবহারের জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন। এই প্রত্যাশা রইলো।

পিযুশ কান্তি রায় চৌধুরী

একুশ বাংলার চিরঞ্জীব সংগ্রাম

নুরুন্নাহার (মুন্নি)

বিশিষ্ট সাংবাদিক আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর লিখা এবং আলতাফ মাহমুদের সুর করা সেই অমর শোক গাঁথা
''আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি ''

গানটির করুণ সুর যখন কানে ভেসে আসে, তখন মনে পড়ে যায় সেই বীরত্বপূর্ন ভাষা সংগ্রামের কথা, মনে পড়ে যায় সেই অকুতভয়ী বীরদের কথা, যাদের দেহের তাজা রক্ত আজ বাংলা মাটিতে একাকার হয়ে মিশে বাংলাকে করেছে উর্বর, দিয়েছে ভাষা মুক্তি,করেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ,দিয়েছে বিজয়ের স্বাদ। একুশ আমাদের সংগ্রামী চেতনাকে করেছে জাগ্রত। একুশ শিক্ষা দিয়েছে সংগ্রামী আন্দোলনে সাহসী হতে, প্রতিবাদী কন্ঠস্বরে দেশীয় শত্রুর বিরুদ্ধে অপ্রতিরুদ্ধ সংগ্রামের সূচনা করতে। একুশ আমাদের সংগ্রামী চেতনার লালিত গর্ব, আত্ম অহংকার। এ অহংকারের অন্তরালে নিহিত আছে হাজারো তরুন প্রাণের মহান আত্ম ত্যাগের অমর স্মৃতি। খুব সহজেই আমরা পাইনি আমাদের মাতৃভাষাকে। এর জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, আর এ সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের দিকে।

১৯৪৮ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী। পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে সর্বপ্রথম কুমিলার ব্রাক্ষনবাড়ীয়ার সাংসদ এডভোকেট ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজীর সাথে যখন বাংলাকেও সংসদে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী জানান তখন প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই প্রস্তাবের পক্ষে তীব্র বিরোধিতা করেন। ''পুর্ব বাংলার মানুষ উর্দু চায়'', এ কথা বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন। এ খবর ঢাকা পৌঁছতে না পৌঁছতেই বিক্ষুব্ধ জনতা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। অতঃপর ২৬ শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় পালন করা হলো ধর্মঘট। ২রা মার্চ গঠিত হলো সর্বদলীয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। ৩রা মার্চ বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের অস্বীকৃতি জানালে ১১ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী পুনরায় ধর্মঘটের ডাক দেয়া হলো। ১০ই মার্চ শেখ মুজিব ঢাকায় আসেন আন্দোলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

১১ই মার্চ সরকার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিলে গ্রেফতার হন গোলাম মাহবুব, শেখ মুজিব, শামছুল হক সহ আরো অনেক নেতৃবৃন্দ। সরকার সমর্থক কর্তৃক ছাত্রদের উপর নির্যাতন আর অত্যাচারের করাল থাবার প্রতিবাদে ১২ই মার্চ জগন্নাথ কলেজে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলে কলেজের সকল সভায় সরকার সমর্থকরা তাদের নির্যাতনের তান্ডবলীলা প্রদর্শন করে। ১৩ এবং ১৪ ই মার্চ যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পালন করা হয় ধর্মঘট। দীর্ঘ পাঁচ দিনের একটানা আন্দোলন এবং বিক্ষুব্ধ জনতার বিক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে বাধ্য করে আত্মসমর্পন পূর্বক সমঝোতায় আনতে। সংগ্রাম পরিষদের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে অনেক তর্ক বিতর্কের পর তিনি আট দফা দাবী মেনে নেন। দাবী গুলোর মধ্যে ছিলো ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নির্ধারিত সময়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়া ইত্যাদি। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন সরকারের পক্ষে খাজা নাজিমুদ্দিন, আর জনাব শামছুল আলম সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে।

ঐ দিন শেখ মুজিবসহ আরও অনেক যুবনেতারা জেল থেকে মুক্তি পান। কিন্তু সাধারন ছাত্ররা হরতালের আহ্বান করলো ১৬ই মার্চ। জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় এলে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দরা তাকে স্বাগত জানাতে তেজগাঁও বিমান-বন্দরেও গিয়েছিলো। কিন্তু ২১ শে মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানের ভাষনে বললেন, ''উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'' তৎক্ষনাৎ বাঙালী জনতা প্রতিবাদে গর্জে ওঠে এবং রাষ্ট্রভাষা কমিটি একটি স্মারকলিপি পেশ করে সভা ত্যাগ করে। ২৪ শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে জিন্নাহ যখন পুনরায় একই কথা বললেন, তখন উপস্থিত ছাত্র জনতা প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জিন্নাহ সমঝোতায় আসার প্রয়োজন অনুভব করলেন, তিনি শেখ মুজিব ব্যতীত অন্যান্য ছাত্রনেতাদের সহিত আলোচনা করতে সম্মত হলেন। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলাকে স্বীকৃতি দানের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করা সত্ত্বেও জিন্নাহ্ উর্দুর পক্ষেই কথা বলে আসছিলেন।

২৮ শে মার্চ লিয়াকত আলী আন্দোলকারীদের দমন করার ঘোষনা দেন। ছাত্ররা প্রতি বছর ১১ ই মার্চকে রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলশ্রুতিতে ২৯ শে মার্চ কতক ছাত্রের জরিমানা করা হলো আর শেখ মুজিবসহ কতক ছাত্র হলেন বহিস্কৃত। ১৯৪৮ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বর জিন্নাহ্ ইন্তেকাল করলেন। এরপর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যথেষ্ট চেষ্টায় লিয়াকত আলী খান হয়ে ওঠেন বেশ তৎপর। ১৯৪৯ সালের ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের মিছিল নিয়ে রাজপথে বের হলে পুলিশের লাঠিচার্জে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এবং কয়েকজন ছাত্রনেতা তখন গ্রেফতার হন। এদিকে ২৩শে জুন জন্ম হয় আওয়ামী মুসলীম লীগের। দলের প্রেসিডেন্ট হলেন মাওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিব হলেন যুগ্ন সম্পাদক। পুনরায় ১৯৫০ এর ১১ ই মার্চ ভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৫১ সালের জানুয়ারীতে ধর্মঘটের আহ্বান করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা। ১৫ ই ফেব্রুয়ারী তাদের সমর্থনে ঢাকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পালিত হয় ধর্মঘট। ঢাকার শিক্ষক, সাহিত্যিক সাংবাদিক ও অন্যান্য পেশার ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে পূর্ববঙ্গের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবী জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয় ২৩শে ফেব্রুয়ারী। ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর রাওয়াল পিন্ডির জনসভায় বক্তৃতাকালে আততায়ির হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান লিয়াকত আলী। অতঃপর প্রধান মন্ত্রী হলেন নাজিমুদ্দীন।

বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে অনশন করে আসছিলেন সেই ১৯৫২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে। নাজিমুদ্দীন ঢাকায় এসে ২৭শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে যখন পুনরায় বলেন, ''উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা '' ২৯শে জানুয়ারী তার এ কথার প্রতিবাদ জানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, অতঃপর সর্বসাধারন। ১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রায় দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহন করে। প্রায় তিন বৎসর জেলে থেকে ১৬ ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন ''২১ শে ফেব্রুয়ারী এসেম্বলী বসবে, তোমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে এমএলদের কাছ থেকে স্বাক্ষর আদায় করবে, প্রয়োজনে এসেম্বলী ঘেরাও করবে''। বঙ্গবন্ধু এবং মহিউদ্দিন আহম্মেদকে ঢাকা সেন্ট্রেল জেল থেকে ফরিদপুর স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে নারায়নগঞ্জ ষ্টীমার ঘাটে আনা হলে তাৎক্ষনিকভাবে উপস্থিত হয়ে ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দরা ''শেখ মুজিবের মুক্তি চাই, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই'' বলে উচ্চকণ্ঠে চারদিক মুখরিত করলো। ছাত্ররা একুশে ফেব্রুয়ারী হরতালের ডাক দিলো। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন দিলেন ১৪৪ ধারা জারি করে।

২১শে ফেব্রুয়ারী গাজীউল হকের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিবাদী হয়ে ক্ষীপ্রবেগে ছাত্ররা দলে দলে ''রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'' শোগান মুখে বেরিয়ে পড়লো রাজপথে, শত শত জনতা যোগ দিল মিছিলে। আর মিছিলটি যখনই ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসের সামনে আসে, তখনি কালবিলম্ব না করে পুলিশ মিছিল কারীদের উপর গুলি ছুড়ঁতে শুরু করে। এক এক করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তাজা তরুন কতগুলো প্রাণ। শহীদ হলেন, মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজের বানিজ্য বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রফিক উদ্দিন আহম্মেদ, গফরগাঁও এর ছাত্র আব্দুল জব্বার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র

বিজ্ঞান বিভাগের এম. এ. পড়ুয়া ছাত্র আবুল বরকত। ঐদিন আরও গুলিবিদ্ধ হলো আব্দুস সালাম। পরে ১৯৫২ সালের ৭ই এপ্রিল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী শহীদ হন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র শফিউর রহমান, শহীদ হন অহিউলাহ, আউয়ালসহ আরো অনেকে।

চারদিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আন্দোলনকারীরা এবং সাধারণ জনতা রক্তে রঞ্জিত রাজপথে ''নুরুল আমীনের রক্ত চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই''। শোগান নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। নুরুল আমীনসহ তার সকল মন্ত্রী পরিষদ ভয়ে পালিয়ে গেলো। অতঃপর ২৩ শে ফেব্রুয়ারী শহীদের রক্ত জনমনে শক্তিতে প্রকাশ ঘটলো । প্রতিজ্ঞা করা হলো রক্তাক্ত স্থানে শহীদ মিনার গড়তে হবে। যা বলা হলো ঠিক তাই করা হলো, এক রাত্রের মধ্যেই কারফিউ উপেক্ষা করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র সাঈদ হায়দারের তাৎক্ষনিক আঁকা নকশায় ছাত্ররা নিজেদের, এবং মাত্র দুজন রাজমিস্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরী করে ফেললো অমর ভাষা সংগ্রামের প্রথম শহীদ মিনার। ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত হলো নব নির্মিত শহীদ মিনার, যার বুকে লেখা ''শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'' শহরের উত্তেজনা উপেক্ষা করে প্রতিটি অলি গলি থেকে বের হয়ে আসলো শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়সের হাজারো জনতা।

ভাষা শহীদের চরম ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হলো পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলার। শহীদদের রক্তাক্ত স্থানে নির্মিত হলো প্রথম শহীদ মিনার, যাকে দেখলে প্রতিটি বাঙালির হৃদয় কেঁপে ওঠে আর্তনাদে, বীরগর্বে শির উন্নত করে শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছে জাগে। বিভিন্ন সাহিত্যিকরা সৃষ্টি করলেন হাজারো রচনার। বিশিষ্ট সাংবাদিক আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী লিখলেন,

''আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি ''

বর্তমানে আলতাফ মাহমুদের সুরে এই শোকগাঁথা গাওয়া হয়ে থাকে। চিরন্তন সত্য যে, মাতৃভাষার জন্য এতো রক্ত, এতো সংগ্রাম, এতো আত্নত্যাগ আমাদের দেশের ন্যায় বিশ্বের অন্য কোথাও এমন নজির পাওয়া যায়নি। তাইতো আমাদের মাতৃভাষা বাংলা আজ বিশ্বের নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধার। আর তাই এ মহান দিবসটিকে অর্থাৎ ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে বাংলাকে করেছে আরো গৌরবান্বিত। বাংলা ভাষার মর্যাদা দানের জন্য যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিলো তা পঞ্চাশ বছর যেতে না যেতেই সমগ্র বিশ্বের সকল মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে। তাইতো একুশ আমাদের আত্ন-অহংকার।

নুরুন্নাহার মুন্নি
৪র্থ বর্ষ, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
চাঁদপুর সরকারি কলেজ

আধাঁরে ঢাকা প্রত্যাশিত সূর্যের উজ্জল রং

প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন

(কাহিনীটির এক বর্ণও মিথ্যে নয় একজন মুক্তিযোদ্ধা হৃদয় ও তার হৃদস্পন্দন মন্দোদরী মাঝে একজন সেঁজুতি বাংলাদেশের রূপক গল্প)

হৃদয় চৌধুরী সহযোদ্ধা কাহিনীটি শুরু করলেন এভাবে। ১৯৯৮ সাল তখন দেশ অতিক্রম করছে শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যার মধ্যে দিয়ে। চারদিকে অথৈ পানি, শহরের সব রাস্তা গুলো এখন নদীতে পরিণত হয়েছে। একটু আগে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। বর্ষণ থামার পর মাথার ওপর শুধু নীল আকাশ, ভূমি শান্ত সমাহিত। স্ফটিক সচ্ছ ফর্সা পানি সর্বত্র। মিশন রোড ধরে পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো হৃদয়ের গাড়ি। খানা খন্দক আর চোরা গর্তের ভয়ে ড্রাইভার খুবই সর্তকতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছে। বিপরীত দিকে থেকে অগ্রসর হচ্ছে আরেকটি গাড়ি, হৃদয়ের গাড়ীটিকে অতিক্রম করে আপন গন্তব্যে অগ্রসর হতে হবে তাই কাছে এসে গাড়িটির গতি একবারেই মন্থর হয়ে এলো।

হৃদয় দেখল যানটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার। দামী গাড়ি শীততাপনিয়ন্ত্রীত কাঁচ নামানো না থাকলে ভিতরে কে আছে দেখা সম্ভব নয়। হৃদয়ের গাড়ির চালকের মতই সর্তক ও গাড়ির চালক। মন্থর হতে হতে পাশা পাশি এসেই গাড়ি দু'টির গতি সীমা শূন্যতে নেমে যায়। পথের অবস্থা খুব খারাপ তাই আরোহী গাড়ির কাঁচ নামিয়ে রেখেছে। গাড়ীর কাঁচ নামানো থাকায় ভেতরটা ভালো করে অবলোকন করে হৃদয়।

পেছনের আসনে চোখ পড়তেই হঠাৎ করেই হৃদয় চৌধুরীর সমস্ত পৃথিবী নড়ে-চড়ে ওঠে ও অবাক বিস্ময়ে নিস্পলক তাকিয়ে থাকে। ওর হৃদস্পন্দন দ্রুততর হয়। বাক স্ফুরন হয় না। এই নারীটিকে বছর দশেক আগে সে হারিয়ে ফেলেছে পৃথিবীর জনারণ্যে। একদশক পর কোথা থেকে সে ফিরে এলো আজ এ অন্য ভুবনে। চিরচেনা নারীটি একদশকের অদেখায় কেমন যেন অজানা হয়ে গেছে......। স্বাধীনতা যুদ্ধের কতেক বছর পূর্বে রজতরেখার নদীর ধারে যুগল জীবন যাত্রা শুরু করেছিল। তারপর দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সীমান্ত অতিক্রম করল ওরা দু'জন। তবে এক সাথে নয় ভিন্ন সময়ে ভিন্ন পথে। ভিন দেশে আবার একত্রিত হয়েছিল ক্ষণকালের জন্যে। যুদ্ধ জয়ের পর সোনারং গ্রামের পোড়া ভিটায় ওরা ফিরে এসেছিল।

স্বাধীন দেশে প্রথম কয়টি বছর একত্রে ছিল। দুষ্ট চক্রের চক্রান্তে এবং কোন রহস্যময় কারণে দু'জনের পথ বাঁকা হয়ে যায়। দুটি জীবন এক সময় সরে যেতে যেতে যেতে ৩৬০ ডিগ্রী হয়ে যায়। আজ হঠাৎ দেখা হতেই হৃদয় অনুভব করলো পৃথিবীর সকল রঙ, সকল সুন্দর অনুভব গুলো বিপরীত মুখী গাড়িটির পেছনের আসনে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। এ আমি কাকে দেখছি এক দশক পরে আমার হৃদপিন্ডের হঠাৎই গতি অতিদ্রুততর হলো, আলোর অফুরন্ত স্ফুরণ আমি উপভোগ করতে পারছি না। আমার সকল পিপাসা একত্রিত হলো।

অতিদ্রুত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে একসময় দুটো যন্ত্র চালিত যান দু'দিকে চলে গেল। যে নারীর মধু প্রেম হৃদয়ের রক্তের প্রতিটি ফোঁটায় অর্নিবচনীয় শিহরণ যোগায় তাকে নিয়ে হৃদয় হীন যন্ত্রদানবটি অতিদ্রুত হৃদয়ের গাড়িটিকে অতিক্রম করে চলে গেলো -। হৃদয় শুধু নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। আবেগ যেখানে প্রবল ভাষা সেখানে মুক, কথাটি সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করলো। বহু দিবস রজনী হৃদয় এ নারীর একটু ছোঁয়ার জন্যে ব্যয় করেছে আজ।

অকস্মাৎ প্রাপ্তির নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে ক্ষণকাল সে চোখ বন্ধ করে থাকলো। চোখ খুলতেই দেখলো অপসৃত হয়েছে সকল সুন্দরের উৎস ওর চিরদিনের আরাধ্য নারীটি। নির্মেঘ আকাশ আবার কাজল রং ধারন করলো। অনাকাঙ্খিত ভাবেই ভারী হয়ে এলো আকাশের শরীর। কামনার নারীটির দোলায়িত নিতম্বের মতই দুলতে দুলতে আকাশ এক সময় বর্ষণ শুরু করলো। সকল আলো নিভে গেলো, সমস্ত পৃথিবী আধাঁর হয়ে এলো। ভারী বর্ষণে পৃথিবীর উদর স্ফীত হলো। বন্যা ক্রমেই বেড়ে চললো, হৃদয়ের মনে হলো বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো ওর চোখের জলে বন্যার শরীর আরো ভরাট হয়েছে। পৃথিবী এখন পোয়াতি নারীর মতো। পানির ভারে টালমাটাল ও দুর্বল। বিগত কয়েকটি বছর ধরে ওর কোন খবর সে জানতোনা। খুব কষ্ট করে হলেও ইচ্ছে করেই ওর সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে রেখেছিলো সে। আজ এক পলকের একটু দেখায় চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠেলো। দারুন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সে। ও কি হৃদয়কে দেখেছে? যদি দেখে থাকে ওর মনের অবস্থা কি হৃদয়ের মতোই? একাত্তরের মুক্তিসেনা আমি হৃদয় চৌধুরী।

চিত্ত চাঞ্চল্য নিয়ে ফিরে এলাম আমার আবাসস্থলে। নির্ঘুম আরেকটি রাত এক সময় শেষ হলো। যামিনি শেষ হতে আর বেশি দেরী নেই। এক দুর্নিবার আর্কষণ মনে করিয়ে দিলো সেই চিত্তহারী দরীর কথা - কত রূপে সে

ছিলো আমার জীবনে বিদ্যমান আজ তা বর্ণনার কোন অক্ষর বা শব্দ আমার জানা শব্দ কোষে নেই । দেখা হলো বক্ষ বিদীর্ণ হলো অথচ উচ্চারণ করতে পারলাম না দু' অক্ষরের মধুর নামটি।

গাড়ির গায়ে অঙ্কিত সংস্থাটির নামের সূত্র ধরে হয়তো জানতে পারবো দরীর বর্তমান অবস্থানের কথা, এইটুকু আজ শান্তনা। বিগত রাতটি একই শহরে একই আকাশের নিচে আমাদের কাটলো, একই বাতাস রক্তকে সচল করলো অথচ আবেগ রইলো অচঞ্চল। আবল্য বন্ধু আমার পাশের বাড়ির মেয়েটি মন্দোদরী। গত একটি দশক ওকে দেখিনি। যদিও বয়ে চলা জীবনের প্রতিটি শ্বাসে অনুভব করেছি মন্দোদরী অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব।

আজ এক দুরূন্ত ঝড় সুস্থির সমুদ্রের স্রোতকে প্রচন্ডভাবে নাড়াদিলো। দরীকে দেখার পর জীবনের স্রোত আজ আবার উল্টো দিকে বইতে শুরু করে। আমার ফেলে আসা শৈশব, দুরন্ত কৈশর, সোনালী যৌবন কথা বলতে শুরু করে। একই গাঁয়ে অভিন্ন ভিটায় বড় হয়েছি আমরা দু'জন। ভিন্ন ধর্মের দুটো পরিবার, অথচ শেকড় একই মাটিতে প্রোথিত। আমি হৃদয় চৌধুরী আর মন্দোদরী দু'টি পরিবারের দু'জন প্রতিনিধি।

পরিবার দুটো আজ হিন্দু মুসলিম পরিচয়ে অভিশিক্ত,অথচ দুর অতীতে যাত্রা শুরু করেছিলো এক অভিন্ন উৎস স্থল থেকে । সময় কাল স্থান ভেদে পরিচয় কোথাও এক আবার অনত্র ভিন্ন। কৃষ্টি সাংস্কৃতি এক, ১৯৭১ এর এক সাগর রক্তক্ষয় করে পরিচয় ও অভিন্ন হয়েছে বাঙালী। সুখ দুঃখ অনুভতি প্রকাশের উচ্চরণ ও অভিন্ন, তারপরও আজ আমরা পৃথক স্রোতে ভেসে চলেছি।

ছোট বেলায় পারিবারিক আলাপ আলোচনায় জেনেছি সাত পুরুষ আগে আমাদের পরিবারের এক অংশ কোন এক মুসলিম সাধকের সংস্পর্শে এসে ধর্মান্তরীত হয়েছিলো, যদিও বাড়ির পরিচয় আজো ঠাকুর বাড়ি রয়ে গেছে। এলাকার লোকজন বলে বড় ঠাকুর বাড়ি। বাড়ির সম্মুখ ভাগে রয়েছে একটি সুরম্য সুন্দর মসজিদ, যা বাংলার মোগল শাসক শাহ সুজা তিনশত বিশ বছর পূর্বে নির্মাণ করেছেন বলে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়। অত্যন্ত অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে মসজিদের সম্মুখে রয়েছে একটি প্রস্তর নির্মিত একক পাথরের বেদী।

বেদীটির মাঝ বরাবর আয়তকার একটি গর্ত, সেখানে হয়তো কোন তুলসী গাছ ছিলো। এটি হয়তো কোন তুলসী মঞ্চ। বেদীটির চার পাশে কিছু মুর্তি উৎকীর্ণ বিষ্ণু এবং অন্যন্য দেবতাদের উপস্থিতি রয়েছে। কোন এক সময় ওখানে পূজোঁর অর্ঘ্য দিতেন ঠাকুর বাড়িটির কোন গৃহবধূ অথবা অন্য কেহ। দরীদের বাড়িটির পরিচয় ছোট ঠাকুর বাড়ি হিসেবে। দু'পরিবারের পূর্ব পুরুষরা ব্রাহ্মণকুলের জমিদার শ্রেণীভূক্ত ছিলেন। আমাদের বাড়ির পুরণো আসবাবপত্র, তামার তৈজস পত্র ও আচার আচরণ সকল কিছুর মাঝেই ছোট বেলায় আমি পাশের বাড়ির সাথে কেমন যেন একটা মিল খুঁজে পেতাম।

ওদের সাথে আমাদের ধর্মছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে ভিন্নতা খুবই কমছিলো। শুনেছি কোন এক কালে আমরা পরস্পর আত্মীয় ছিলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কিছু বদল হয়নি। দু'টো পরিবার আজ দু'ধর্মের হলেও কোথায় যেন একটা অদৃশ্য গ্রন্থি এখনও বিদ্যমান। অনুকুল পারিবারিক পরিবেশ এর কারণে দু'জনের কাছে আসতে খুব একটা সময় লাগেনি। তেমন কোন উলেখযোগ্য বাধাও অতিক্রম করতে হয়নি। দরীর বাবার নাম আর আমার বাবার নামের উচ্চারণ ভিন্ন দু'টি ভাষা হলেও শাব্দিক অর্থ একই ছিলো। দরীর বাবার নাম উচ্চারিত হতো বাংলাভাষায় আর আমার বাবার নাম উচ্চারিত হতো আরবী ভাষায়। আমাদের পারিবারিক পদবী পন্ডিত ওদেরও তাই। ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া সংস্কার ও কৃষ্টিতে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষণীয় ছিলো না। পারস্পরিক সম্বোধনেও আমি কোন ভিন্নতা দেখিনি। কাকা, মামা, জেঠা, দাদু, মা, কাকী সব গুলো সম্বোধন একই প্রকার।

আমার ডাক নাম হৃদয়, শুনেছি নামটি রেখেছিলেন কাকীমা, এই নাম রাখার বিষয়টি আমাদের পরিবার সহজভাবে গ্রহণ করেছিলো। ১৯৪৭ এ দেশ ভাগ হওয়ার পর পূর্ব বাংলার সংখ্যালগু হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক স্বচ্ছল ও শিক্ষিত অংশ, বিশেষ করে সরকারি চাকুরীরত লোকজন ও তাদের পরিবার দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। সে সময় আমাদের গ্রামের অবস্থা ছিলো ভিন্নরূপ, ১৯৬৫ সনের পূর্বপর্যন্ত গ্রামের সামাজিক কাঠামোতে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি হিন্দু মুসলিম জনসংখ্যার হার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেনি।

মন্দির বা মসজিদ নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি আমাদের গ্রামের সামাজিক ব্যবস্থায় ছিলো না। হিন্দু মুসলিম দু'সম্প্রদায়ের লোকজন সম অধিকার নিয়েই আমাদের সোনারং গ্রামে বসবাস করতো। রজত রেখা নদীর পানি তখনও স্বচ্ছই ছিলো। আমার মনে আছে ১৯৬৫ সনের যুদ্ধের প্রাক্কালে পার্শ্ববতী নারায়নগঞ্জে খানিকটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিলো। দরীর কৃষ্ণা পিসি ও আরাধনা মাসি নিরপত্তার কারণে আমাদের বাড়িতে থাকতো। ওরা তখন বুঝতেও পারেনি আমাদের পরিবার আলাদা ধর্মের কোন জনগোষ্ঠি। আমার

বাবা, জেঠা ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত মনের মানুষ। পরিপূর্ণ বাঙালী মুসলিম। তারা ধর্মভীরু ছিলেন কিন্তু গোঁড়া ছিলেন না অথবা ধর্মান্ধ ।

আমার দাদু ব্রিটিশ ভারতে রাজকর্মচারী ছিলেন, ফলে গ্রামে আমাদের শিকড় প্রোথিত থাকলেও আমার বাবা কাকারা অনেক পুর্বেই শহরবাসী হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে আমরা গ্রামে যেতাম বিশেষ করে রাজনৈতিক বা অন্য কারণে শহরে নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হলে আমরা বসবাস করার জন্য গ্রামে যেতাম। ১৯৭১ সনে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে, পাক হানাদের পশুদের ভয়ে দরীদের পরিবার অন্য অনেকের মতো ভারতে শরনার্থী হয়।

পরবর্তী সময়ে আমিও ভারতে গিয়ে ওদের সাথে মিলিত হই। সামরিক প্রশিক্ষণ শিবিরে যাওয়ার পুর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত ওদের সাথেই শরণার্থী শিবিরে থেকেছি। একবারও মনে হয়নি আমি পরিবারের বাইরে আছি। দেশ স্বাধীন হলে দরীরা সকলের মত পোড়া ভিটে মাটিতে ফিরে আসে। ওদের অবস্থা এমনিতেই খারাপ ছিলো, পরিবারের কর্তাটির এলোমেলো জীবন যাপন মুক্তিযুদ্ধ পুর্ব সময়ে ও পরিবারটিকে লক্ষ্মীর কৃপা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলো। বাস্তুচ্যুত হওয়ার কারণে সদ্য স্বাধীন দেশে ওদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পরবর্তী তিন চার বছর ওরা গ্রামেই ছিলো। পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তার অভাবে বাড়িঘর বিক্রি করে মন্দোদরীর পিতা আমার প্রিয় সত্যকাকু নারায়নগঞ্জ শহরে ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেন।

এভাবেই মন্দোদরীরা নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে যায়। ওদের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হতে থাকে। তখনও আমি ওদের সাথে আমার সম্পৃক্ততা বজায় রাখি। অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে ভাগ করার চেষ্টা করি ব্যাথা আর বেদনা, সুখ দুঃখে হয়ে থাকি একাকার। দরী, দারুন কষ্ট আর সীমাহীন অন্টনের মধ্যে স্কুল ফাইনাল ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে, পরিবারের হলে ধরার জন্যে একটি চাকুরী জোগাড় করে। স্নাতক আর স্নাতকত্তোর ডিগ্রী চাকুরীরত অবস্থায়ই লাভ করে। ওর তিন বছর আগে পড়া শোনা শেষ করে আমি পেশাগত জীবনে প্রবেশ করি।

পরিবাটির সাথে আমার যোগাযোগ অব্যাহত ছিলো। কাকীমা প্রায়ই বলতেন ''হৃদয়, পুর্বজন্মে আমার ছেলে ছিলো।'' আমার প্রথম জীবনের অর্জিত অর্থ আমি আমার পরিবার পরিজন ও দরীদের পরিবারের জন্য সমভাবে ব্যয় করার চেষ্টা করছি। দরী পড়া লেখা শেষ করে একটি ভালো চাকুরী পাওয়া পর্যন্ত আমার চাকুরী জীবনের প্রায় অর্ধযুগ সময় ব্যয় হয়ে যায়। আমার তখন ২৮ বছর চলছে দরীর পঁচিশ। এবার আমি যৌথ জীবন যাপনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। মঙ্গল সূত্র দিয়ে সম্পর্কটা স্থায়ীরূপ দিতে চাই। এক সময় হৃদয় আর মন্দোদরী এক ছিলো। কিন্তু অদৃেষ্টের পরিহাস নিয়তি তাদের পর করে দিলো। কিন্তু শেষ বললেই তো......আর শেষ হয় না।

সেঁজুতির কথা ঃ

পাঠক, সেজুতি হৃদয়ের স্ত্রী। কোন এক রহস্যময় কারণে মন্দোদরীর সাথে হৃদয়ের বিয়ে ভেঙ্গে গেলে এক সময় সেঁজুতির হৃদয়ের আসন্ন আধার তাড়াতে সাজের বাতি হয়েছিল। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি খুব ছোট দিলাম। হৃদয় চৌধুরীর সাথে আমার পরিচয় ছিলোনা। মন্দাদরীর নিকট শুনেছিলাম যুদ্ধে হৃদয়ের বীরত্ব গাঁথা। গত সন্ধ্যায় টিভিতে দেখলাম প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী তফাজ্জল হায়দার চৌধুরী মারা গেছেন। ঘোষক জানালেন একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা তফাজ্জল হায়দার চৌধুরী দারুন সাহসের সাথে দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্যে যুদ্ধ করেছেন সে জন্যে সরকার পদক দিয়ে তাকে সম্মানিত করেছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদানের জন্যে প্রাপ্ত পদকটা ওর বাড়িতে শো-পিস হিসেবে নয় সর্বদার জন্যে সংরক্ষিত আছে। বীরত্ব গাথাঁ খোদাই করা তামার পাতটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। গত বছর একবার জনাব চৌধুরীর বাড়িতে আমি পদকটা দেখেছি। অনেক যত্ন করে ওর পরিবার ওটা সংরক্ষণ করছে। আজ ৮ ডিসেম্বর চাঁদপুর মুক্ত দিবস। আমার স্বামী বীর মুক্তিযোদ্ধা হৃদয় চৌধুরীকে সম্মাননা দেওয়া হবে। আমিও হৃদয়ের আজকের এই ক্রেস্টা, আমার বাড়িতে আজীবন সংরক্ষণ করবো, গৌরবের স্মারক হিসেবে। আজ যদি দরী থাকতো, আর আমরা যদি একত্রে হৃদয়ের এই প্রাপ্তির অংশীদার হতাম তাহলে মন্দ হতো না।

কিন্তু কি করবো আমি যে কারো সাথে হৃদয় কে ভাগ করতে পারি না। আমার একদম সহ্য হয় না। মন্দোদরী ও হৃদয়ের অতীত আমার জন্যে বিষ ফোঁড়া। দরী প্রসঙ্গ এলে মাঝে মধ্যেই আমি হৃদয়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করি। ওর সকল বিষয়ে অনাগ্রহ দেখাই। ও চলে গেলে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। খুটিয়ে খুটিয়ে সকল বিষয় চিন্তা করি, লজ্জিত হই আমার কৃতকর্মের জন্যে। মনে হয় ছুটে যাই ওর কাছে। আমার পাখি হয়ে যেতে ইচ্ছে

করে। আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। এক এক সময় মনে হয় হৃদয়কে আমি মন্দোদরীর বুক থেকে কেড়ে নিয়েছি। অপরাধ বোধ আমাকে আঁকড়ে ধরে তখন আমি অসহায় হয়ে যাই।

মন্দোদরীর কথা ঃ

আজ ৮ ডিসেম্বর ২০০৫ স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারীদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ৩৪ বৎসর পূর্ণ হয়েছে বিজয় দিবসের। ভোর বেলা বিজয় স্তম্ভে ফুল দিতে এসেছিলো দরী সাথে তার ছেলে শুভ্র। এখানে এসে শুনেছে একাত্তরের মুক্তিসেনা হৃদয় চৌধুরীকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হবে। সন্ধ্যা না হতেই সমগ্র অনুষ্ঠানস্থল জনতায় ঢলে ভরে গেছে। সবার অলক্ষে ছেলেকে নিয়ে এক কোনে এসে বসলো দরী। অনুষ্ঠান শুরু হতে আর বেশি দেরী নেই।

পরাধীনতার দায় থেকে মুক্তি চেয়ে একদিন যারা ঘরের মায়া, নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার বদলে সুখকর ভবিষ্যৎ ছেড়ে অন্ধকার জেলের কুঠুরি বেছে নিয়েছিল, সকল সময় যাদের তাড়া করে ফিরত মৃত্যু-স্বাধীন হওয়ার চৌত্রিশ বছর পরে মনে চিত্র খচিত একটি ক্রেস্ট দিয়ে দেশ সেই আত্মত্যাগী সন্তানদের মুল্যায়ন করছে মুক্ত স্বদেশের নব প্রজন্মের কিছু তরুন। আগের মতোই ঋতু দেহে দীপ্ত পদক্ষেপে মঞ্চে এসে বসল হৃদয়। স্বীধনতা সংগ্রামীদের তালিকায় শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে ছিল হৃদয় চৌধুরী । বীরের মতো যুদ্ধ করেছে মুক্ত স্বাধীন স্বদেশে পালিয়েও বেড়িয়েছে বহুদিন।

নিজের দেশের স্বাধীনতা আনতে চেয়ে বিদেশি শাসকের কাছে কঠোর শাস্তি ভোগ করেছে হৃদয় যুদ্ধ করেছেন বলে সুবিধে আদায় করবেন, হৃদয় তা চাননি। এবার নেহাত বাড়ির লোকজনের উপরোধ এড়াতে পারলেন না। তা ছাড়া ভেবেছিলেন এ তো আর নির্বাচনী লড়াইয়ে নামা কিংবা চাকুরি পাওয়ার তদ্বির তদারক নয়-সামান্য একটা ধাতুর পাত। একটি স্বীকৃতির নির্দশন।

নথিপত্র আগেই সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। ওর ছেলে মেয়ের এ বিষয়ে আগ্রহ খুব। ওরাই তার বিপবী জীবনের ঘটনাপঞ্জি আয়োজকদের নিকট পেশ করেছিল ওরা। তারপরও ইচ্ছে ছিল না হৃদয়ের। শুধু ভক্তদের চাপে সভায় যেতে রাজি হয়েছেন । তাদের এক ঘনিষ্ঠ জন দেশের মুক্তির জন্য লড়েছেন -ওই ধাতব নির্মিত পাতটায় তার প্রমাণ থাকবে। মুখের কথায় আর কে বিশ্বাস করে। সেই উপলক্ষেই চৌত্রিশ বছর পর আলোকময় সুন্দর সাজানো মঞ্চে এসে বসেছে হৃদয়। মানুষের কতগুলো স্মৃতি জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। সেসব স্মৃতিকে বাদ দিলে জীবনের একটা অংশকেই বাদ দিতে হয়। এমন একটি স্মৃতি, সোনারং গ্রামে বিজয়ের এক বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠান। মঞ্চে হৃদয় বিজয়ী বীর, শ্যাম বর্ণের সুঠাম দেহের যুবক আমার হৃদয়, অদ্ভুত সুন্দর তার চোখ, দুটো ভ্রু টানা টানা মেয়েদের মতো।

ভেজা ঠোট দুটি গোলাপী রঙের দেহখানা ছিপছিপে দোহারা গড়নের। সিনা টান টান গর্বিত শরীরে মাথা উচু করে সমগ্র মঞ্চ আলোকিত করে বসে আছে আমার হৃদয়। মঞ্চের চারপাশে জড় হয়েছে আশপাশ সাতগ্রামের ছেলে বুরো নারী পুরুষ সকল ধর্মের অনেক মানুষ। সবাই বীরের স্তুতি করছে । এ বীর দরীর হৃদয়। সংবর্ধনার জবাবে হৃদয় যখন মোহনীয় বাচন ভঙ্গিতে বীরের মত উচ্চারণ করল তার মানচিত্র, পতাকা, সংঙ্গীত বিজয়ের অপূর্ব কথকতা।

তার সেই অপূর্ব বাচন ভঙ্গি অনেকের সাথে আমার সমস্ত অন্তর আনন্দ ধারায় পূর্ণ করে ছিলো। আমি ঈশ্বরকে বললাম হে আমার প্রভু স্বার্থক আমার মানব জন্ম, স্বার্থক আমার ভালোবাসা। মুহুমুহ করতালির মাঝে আমার প্রাণেশ্বর জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন বীরকে ফুলে ফুলে ঢেকে দেওয়া হলো। আজ বার বার হচ্ছিলো মনে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরের বছরের অনুষ্ঠানটির কথা। সদ্য মুক্ত স্বদেশ বিজয়ী দেশে মুক্তিসেনাদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। সেদিন ওর সেই সম্মানের ভাগিদার শুধুই আমি। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে আমাকে বীর বন্ধনা সংঙ্গীত গাইতে হয়েছিল।

অন্তরের সবটুকু আবেগ আর পবিত্রতা নিয়ে আমি মঞ্চে উঠেছিলাম। গেয়েছিলাম বীর বন্ধনা সংঙ্গীত। ঘরে ফিরে আমার সংগীতের জন্যে জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ জানিয়েছিল তরুন মুক্তিসেনা হৃদয়। আজ আমি বড়ই অপাংতেয় । এখন মঞ্চের প্রথম সারিতে পাতা আসনে বসে আছে ওর বউ সেজুঁতি, পুত্র কন্যা ও স্বজনরা। বীর জায়ার দৃষ্টির আড়ালে অনকে দুরে জনতার ভীড়ে বসে আছি আমি আর আমার সন্তান শুভ্র। শুভ্র বলল, দেখ মা - মামাকে কেমন সুন্দর লাগছে। ঠিক যেন বীরের মতই। হে আমার ঈশ্বর আমি বলতে পারছি না শুভ্র তুই এই বীরেরই আত্মজ। সুর্যদেবের সন্তান মামা নয়- বাবা বল তুই। এই সম্মামনার তুইও যে সমঅংশীদার। বীর বন্ধনা শেষ হতে না হতেই চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আমার আশ্রয়ে ফিরে আসি আমি। আর কতকাল হৃদয়ের ভালোবাসার ধনকে আমি বুকে আঁকড়ে থাকব। শুভ্রকে ওর ঠিকানা দিতে হবে। কোন কালিমা যেন শুভ্রকে স্পর্শ করতে না পারে সে চেষ্টা আমি মন্দোদরী করবই।

কঠিন ভালোবাসার পরও কখনো কখনো হৃদয়কে বুঝতে পারতাম না আমি মন্দাদরী, হৃদয়ের দরী। দুইজন একত্র হওয়ার পর কেন জানি আমার মনে হতো মাত্র কদিনেই দরী পুরনো হয়ে গেল? ২৫ বছর আগের কথা কিছুদিন মেলা মেশার পর স্বাভাবিক একটি সংবাদ দরীর সন্তান হবে। এই সংবাদটাই নিরুত্তাপ করে দিয়েছে পন্ডিত হৃদয় চৌধুরীকে কিংবদন্তীর নায়ক, মুক্তি সেনা, সাভাবিক খবরটি তার কাছে অস্বাভাবিক । কিংবা দরী অনাগত সন্তান নষ্ট করবে না জেনে ক্ষুব্ধ হয়েছে হৃদয়? মুক্তির মিছিলে লড়াকু সৈনিক হৃদয়কে ভালো বেসেছিলো একটি নিবেদিতা মেয়ে দরী। এই ঘটনার পর কেন এখনো ভীরু হৃদয়কে ভালো লাগে দরীর সে তা জানে না।

এর নামই কি ভালবাসা যে ভালোবাসা পুড়িয়েছিলো রোম নগরী। ৮ ডিসেম্বরের মুক্তি দিবস পালিত হলো। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা বন্ধ হয়ে গেলো। হৃদয় চৌধুরী আর ওর সাথীদের অমিত তেজ কোথায় গেল? দরী ভাবে হয়তো রজত রেখার স্বচ্ছজল শুকিয়ে গেছে, অথবা সোনারং তার রং হারিয়েছে। যেমন স্বধীনতার চৌত্রিশ বছর পর মনে হচ্ছে অর্জিত স্বদেশ তার সবুজ রং হারাতে বসেছে যা কিনা ত্রিশ লক্ষ রক্তের বিনিময়ে কেনা? রক্তবলয় আবার তার গোলক ভেঙ্গে সবুজ জমিন রাঙ্গা করবে নাতো? হৃদয়, মন্দোদরী সেঁজুতি ও আরো অনেকে যে কাজটি করেছে সেখানে কোথায় কোথায় অসঙ্গতি তা খুঁজে বের করার ওপরই সকলের মঙ্গল।

একাত্তরের পরাজিত অশুভ শক্তি হৃদয় মন্দোদরীর মাঝে ফাটল ধরিয়েছে। সারা জীবনের স্বপ্নকে চক্রান্ত করে ব্যর্থ করে দিয়েছে। আঠারো বছরের তরুন আজ বায়ান্নতে এসে স্বপ্ন দেখতে চাইছে না। সহিংসতার রক্তাক্ত ধারায় সে কি আজ ভীত? তার ঘুম এখন অনিরাপদ, তন্দ্রা এখন অনিরাপদ। সে এখন স্বপ্ন দেখে না - কাউকে স্বপ্ন দেখাতে পারে না। মন্দোদরী ভাবে কোথায় মুক্তি যোদ্ধাদের সেই স্বপ্ন, সেই সাহস, সেই রক্তাক্ত অথচ উজ্জ্বল অধ্যায়? তিন দশক না পেরোতেই বিস্মৃত হয়ে গেছে?

লেখকের কথা ঃ

আলোচনার আসরে লেখক উপস্থিত ছিলেন। কোন কথা বলেননি তিনি শুধু শুনেছেন। তারপরও লেখক বলে কথা। পর্যবেক্ষণের চোখটি তার খোলাই ছিলো, প্রিয় পাঠক শুনুন তার কথা, হৃদয় চৌধুরী স্বাধীনতা সমরের একজন বীর সেনানী। দুরন্ত আঠারোর টগবগে তরুন সময়ে তিনি লড়ে চলেছিলেন সেই মহান যুদ্ধ। এখন তিনি তিপান্ন বছরের প্রৌঢ়। যুদ্ধে তার অবিস্মরণীয় লড়াই আমাদের অঞ্চলে কিংবদন্তী তুল্য। জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তার পদরাচরণায় সৃষ্ট সস্মৃতি বহুল মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাঁথা। এই বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে জড়িয়ে আছে এক বীর নারীর গল্প। যুদ্ধে বিজয়ী এই বীরের ব্যক্তি জীবন কুসমাস্তীর্ণ নয়।

মসৃন গতিতে তার জীবন স্রোত বয়ে যায়নি। অজানা সে কাহিনী নিয়ে আজ আমাদের গল্পের আসর। দেশপ্রেম আর নরনারীর প্রেম নিয়ে এক বিতর্ক সভার আসরে হৃদয় চৌধুরীর সহযোদ্ধা বর্ণনা করেছিলেন দরী-হৃদয়ের প্রেম কাহিনীটি। সন্ত্রাস আর আত্মহনন নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে, পরিশ্রুতবোধ আর শুদ্ধ জীবন চেতনার মধ্য দিয়ে আমাদের বাংলাদেশের হাজার বছরে অহংকার নর নারীর প্রেম এবং তা থেকে দেশপ্রেম নিয়ে কথা হচ্ছিল। আলাপের উষ্ণতায় শীতের মনোরম বিকেল মুগ্ধকর হয়ে উঠছিলো। হৃদয় দরীর প্রেম তখন উদাহরণ হিসেবে চলে এল। প্রহরগুলো ঝরে যাচ্ছিল, যেমন শীতের পাতার মতো বছরে প্রতিটি দিন ঝরে যায়। ঝরে ঝরে জমা হয় অতীত সমুদ্রে। এভাবে সব বর্তমানই মিলে যায় গতকালের সাথে। সময়ের মতো মিশেয় যায় মানুষের স্মৃতি-বিস্মৃতির বহমান ধারা।

মানুষ মূলত সময়ের শেকলেই বন্দি। শৈশব, কৈশোর অতঃপর যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্য, সব শেষে অনন্তের পথে যাত্রা এভাবে বদলে যায় মানুষের জীবনচক্র (সময়ের সাথেসাথে বদল হয় মানুষের কর্মনীতি-কৌশল। বদলে যায় দৃষ্টিভঙ্গি এবং গ্রহণবর্জনের ক্ষমতা-অক্ষমতা। এসবের যোগফল নিয়েই অতীত হেঁটে যায় বহমানকালের দিকে যেমন হেটে এসেছেন অনেক দুর হৃদয় চৌধুরী। বিজয় জেলার আলোক দীপ্ত আমরের আয়োজকরা তার নাম ভুলে যায়। তবুও কেউ কেউ এখনও তাকে ডাকে। ডাক পড়লে তিনি আসেন শূন্যস্থান পুরন করেন।

দিন আসে আর যায়। তেমনি বছরও। এই তো ১৯৭১ সাল, চোখের ওপর দিয়ে , হাতের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে একরকম পালিয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল হিসাব-নিকাশের পালা। কী পেলাম, কী হারালাম। কতটা এগিয়ে গেল মানুষ। আর কতদুর যাবে ভবিষ্যতের দিকে? ইত্যাকার নানাবিধ প্রশ্নের জটাজাল আমাদের দৃষ্টির আঙ্গিনায় হইচই করছে। আমাদের হৃদয় চৌধুরী শক্তি সামর্থ হারিয়েছেন। রাইফেল ধরা সবল হাত তখন অনেকটা দুর্বল পরপর ও কথা হচ্ছে তিনি কি হারিয়ে যাবেন? শিল্প-সাহিত্যের পাতা থেকে ও কি মুক্তি যোদ্ধার হারিয়ে যাবেন।

দেশ সর্বোপরি শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গানেও এ জিজ্ঞাগাসা সবল স্বাস্থ্য নিয়ে মাথা তুলেছে। এটাই আজ আশার আলো।

আমরা স্বাধীনতা অর্জনের পয়ঁত্রিশ বছরে এসে পা রেখেছি। কিন্তু যে বছরগুলো আমাদের ছেড়ে গেল তার থেকে আমাদের অর্জন আমরা কতটা বুঝে নিতে পেরেছি এ আত্মজিজ্ঞাসার জবাব আমরা কতটা বুঝে নিতে পেরেছি এ আত্ম-জিজ্ঞাসার জবাব আমরা পেতে চাই।

শিল্প-সাহিত্য জীবনের কথা বলে। জীবনের চাওয়া-পাওয়া, স্বপ্ন-আশা-সম্ভাবনা , প্রেম-বিরহ, দুঃখ-যাতনার কথা বলে। এটা নতুন কোনো বিষয় নয়। এ নিয়ম পৃথিবীর নিয়মের মতো পুরনো। মনুষ্য জীবনের যেমন ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। একইভাবে প্রেমের ক্রমধারা অস্বীকার করার উপায় নেই। আকস্মিক বদলের কোনো সুনামি বয়ে আনবে না। আলোচনার আসরের পরিবর্তন এবং রূপান্তর ধীরে ধীরে। অবিশ্বাস্য কোনো পরিবর্তন বা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার মতো কোন ঘটনা আমাদের আনন্দ, ভালোবাসা, স্বপ্ন ঘিরে। তার সাথে যুক্ত তীব্র যন্ত্রণা, শঙ্কা ও অন্তহীন অন্ধকার যা সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গভীর অবসাদের অতলান্তে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল।

এক সকালে বাংলাদেশের মানুষ নতুন সূর্যের সোনালি আলোকে এক স্বচ্ছ দুনিয়ার ছবি সবার সাথে দেখছিল। অথচ পঁয়ত্রিশ বছরপর আমাদের অসতর্কতার জন্যে অলক্ষ্য থেকে এল এক শকুন তার বিশাল পাখা মেলে। ক্রুব্ধ সে শকুন। তার আলয়ে ঘটে গেছে এক রহস্যময় অভাবিত ভয়াবহ ঘটনা। সে বলল, হয় তোমরা আমার দলে নতুবা আমার শত্রু। ধসের আলখেলা থেকে বের করলো বোমা ছিন্নভিন্ন করলো মুক্তিযোদ্ধা। সুপ্রিয় পাঠক মুক্তিযোদ্ধা হৃদয়, বীরজায়া মন্দোদরীর প্রেম ভালোবাসা প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি এবং ওদের ঘিরে আরো কয়টি চরিত্রই আমার স্বাধীনতা, আমার বাংলাদেশ। চলুন হৃদয়ের কথা শুনি।

সেঁজুতির ভাবনা অন্য রূপ - আমরা অবশ্যই একটি আলোকজ্জ্বল চমৎকার সকালে ঘুম থেকে উঠবই। সুন্দর স্বপ্নের আবেশ থাকবে তখন। দু'মুঠো ভাত, সন্ত্রাসীদের হাতে সম্ভ্রম হানির ভয়, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এর জন্যে আত্মাহুতি দেবে না কোন মুক্তিযোদ্ধার অসহায় কন্যা সন্তান। হৃদয়ের মতো মুক্তিযোদ্ধারা সভা সমিতির আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশে অনেক পায়রা ওড়াবেন। শান্তির পায়রা সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে অনন্ত নীল আকাশে ওড়বে। তখন মুক্তিযোদ্ধার হৃদয় চৌধুরী বিকেলের আকাশে অন্ধকারের আলো খুঁজে পাবেন। তিনি সেই আলো ছড়িয়ে দিবেন গ্রাম বংলার পথে প্রান্তরে। তখন সকল দৈন্যতা গুছে যাবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নজরুল গবেষক
প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন

ভাষা শহীদদের স্মরণে মরুপলাশ এর কিছু পংক্তিমালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস – ২০০৭ উপলক্ষে

ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত এর একগুচ্ছ ভাষার ছড়া

(১)
বকুল হয়ে ঝরে

ব – এর মানে বরকত হবে
র – এর মানে রফিক,
বাঙলা দাবীর মিছিল করে
জব্বার এবং শফিক।
মায়ের ভাষার তরে
বকুল হয়ে ঝরে!
পড়লো ঝরে কত্তো আরো
বাঙলা প্রেমী ছালাম,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফুলে
ওঁদের করি সালাম।

(২)
মায়ের ভাষা

আমার মায়ের ভাষা যারা
পাল্টে দিতে চায়,
শক্ত শেকল দিয়ে তাদের
বাঁধবো বুটের পায়!

লিখবো মায়ের ভাষায় চিঠি
হাসবে চাঁদও মিটি মিটি।

বাঙলা চিঠি বলবে কথা
সকল ঠিকানায়,
যেমনি মায়ের কথা–সুরে
সব পাখিরা গায়।

(৩)
জব্বারের ছবি

লাল শিমুলের পাপড়ি দেখে
জব্বারের ওই ছবি এঁকে
ফাগুন দিনে আগুন ঝরা
ফোটলো হাজার ফুল,
করতে স্মরণ ভাষার সেনা
হয়নি তাদের ভুল!

(৪)
চাষ

এই দেশেতে জন্ম আমার
এই মাটিতে বাস,
মা করেছেন আমার বুকে
বর্ণমালার চাষ।

(৫)
একুশ মানে

ফেব্রুয়ারীর একুশ মানে
ফাগুন মাসের আট,
মায়ের চোখে খোকন সোনার
রক্তে ভেজা শার্ট।

একুশ মানে–
রাষ্ট্রভাষা বাঙলা দাবীর ঝড়!
ঘর ছেড়ে যে ভাইটি গেলো
ফিরলো না তারপর!

একুশ মানে–
ভাষার সেনা শহীদ হবার দিন
থাকবে মিলন কথায়–কাজে
শপথ করার দিন।

(৬)

শপথ ছিলো

বাঙলা ভাষার দাবী নিয়ে তুলতো যাঁরা ঝড়!
আটই ফাগুন ছিলো তখোন ভীষণ ভয়ংকর!
চাইলো তাঁরা ভাষার মান
গুলীর মুখে হারায় প্রাণ
সেই শহীদের শপথ ছিলো 'কর নতুব মর'!!

(৭)

ফিরে এলো ফাগুন

ফিরে এলো ফাগুন
দেখনা চেয়ে দেখনা চেয়ে কৃষ্ণচূড়ায় আগুন!
শিমুল পলাশ জবা
রক্তে ভেজা ফুলগুলো সব করছে শোকের সভা!

রক্তগুলো তাঁদের
মায়ের ভাষা আনতে গিয়ে লাগলো গুলী যাঁদের।

ফাগুন এলে ঘুরে
সেই শহীদের স্মৃতি ছায়ায়
আমরা ছুটি মোহন মায়ায়
গান গেয়ে যায় কোকিলগুলো কুহু কুহু সুরে।

(৮)

ভাষার তরে

এই মাটিতে মিশে আছে
বাঙলা ভাষার সেনা,
তাঁদের বুকের রক্ত দিয়ে
বর্ণমালা কেনা।

তাইতো ওঁদের সালাম করি
ভাষার তরে যাঁরা,
গুলী নিলো বুক উঁচিয়ে
বীর মহাবীর তাঁরা।

(৯)

বন্দি একুশ

বন্দি একুশ মুক্ত হলো
আঁধার গেলো দূর,
একুশ আমার কণ্ঠে বাজায়
বর্ণমালার সুর।
একুশ আমার জাতির প্রতীক
একুশ পরিচয়,
মায়ের ভাষা বাঙলা ভাষা
বিশ্ব করে জয়।
একুশ আমার গানের কলি
একুশ আমার ছন্দ
একুশ আমার শাপলা–শালুক
কলমী ফুলের গন্ধ।

(১০)

লাল ফুলের গান

বলতে পারো ছন্দামনি
পলাশ, জবা লাল কেন?
থোকা থোকা রক্ত মাখা
কৃষ্ণচূড়ার ডাল কেন?

জবাব তোমার নেই কি জানা?
শোনো তবে কান দিয়ে–
সেই ফাগুনে সোনার ছেলে
ভাষার তরে জান্ দিয়ে–
লুটায় তারা মাটির বুকে;
মায়ের ভাষায় প্রাণ এলো,
সেই ছেলেদের রক্তে ভিজে
লাল ফুলেদের গান এলো।

শহীদ স্মরণে

পীযুষ কান্তি রায় চৌধুরী

মায়ের বুলি বাংলা আমার
কত মধুর ভাষা
সালাম,জব্বার,বরকত, রফিকের
অনেক ছিল আশা।
বুকের রক্ত ঢেলে ছিল
বিরত্বের বেশে
মাতৃভাষা বিশ্বসভায়
স্বিকৃতি অবশেষে।
তাঁদের মোরা স্মরণ করি
২১ ফেব্রুয়ারী এলে
ফুলে ফুলে শহীদ মিনার ভরি
আমরা দলে দলে

(২)

ভুলি নাই,ভুলবো না

মাগো তোমার বাংলা ভাষা
হাজার বছর ধরে,
বাঙ্গালী আমরা ভুলি নাই কখনো
রাখবো চির তরে।
এ ভাষার তরে যারা দিল প্রাণ
২১ ফেব্রুয়ারী,
পলাশ শিমুলে ভরবো মোরা
তাঁদের স্মরণ করি ॥

(৩)

ভালবাসার যাতনা কাহারে কয়

ভালবাসার স্বপ্ন যে কত বেদনা
যদি কোন দিন না হয় বসন্ত ছোঁয়া
তিলে তিলে মর্ম বেদনা
সখিরে শুধু বলা যায়
যাতনা কাহারে কয়।
দিবস রজনী চলিছে ধেয়ে
কল কলো রবে বইছে নদী
সাগরের বুকে শয্যায়
নদী- সাগরের সঙ্গোপন মিলন
আমার স্বপ্ন খানি।
তুমি আমারি, তুমি আমারি॥

(৪)

ঈগল লঞ্চে কিছুটা সময়

নদীর বুকে ভাসমান কচুরিপানা দুলছে
সচ্ছ জলকে ভেদ করে ঈগল লঞ্চ চলছে
গতি তার সুকানীর হাতে।
দিক নির্দেশনায় চোখ রাখে সুকানী
গন্তব্য বহু দুর, যেতে হবে রাজধানী
ডিঙ্গিঁ নৌকা বানিজ্যিক নৌকা ঢেউয়ের তালে
চলছে আর দুলছে।
ঈগলের চোখ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে
কত নামাঙ্কের নৌযানগুলি
পড়তে থাকে ঈগলের ছোট বড় যাত্রী সকল,
নদীর বুক চিরে চলছে ঈগল
কখনো কোল ঘেঁসে কখনো মাঝে
গায়ের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা স্নানে রত
আবার ভিজে কাপড়ে নারীর সৌন্দর্য্য কলসী কাঁখে
পবিত্র জলে পাপ মুক্ত।
আকাশের নীলিমায় সূর্য্য রশ্মি পূর্ব পশ্চিমে
হালকা বাতাস বইছে, সবুজের ফসল, গাছ-গাছালি।
গাংচিল ঢেউয়ের তালে দোলা খায়
কি অপরূপ মনমুগ্ধকর,
জেলেরা জাল ফেলে মাছ শিকার করে
ঈগলের রেলিং এ দাঁড়িয়ে চায়ের কাপে চুমুক
চোখ দুটো দৃশ্য পটে-
কি চমৎকার বাংলার রূপ ॥

আঞ্চলিক গানের সম্রাজ্ঞী শেফালী ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসে কবিতা নিবেদন –
ন জমে মেঘ বুকের আসমনত ?

মোহসিনা বেগম

তোয়ার লাই আর পরান ফাডি
যারগই।
তুয়ি ন- বুজো রইলা- কডেগই ?
যে দিন তোয়ার বুহের অরণ্য মুখ
রাহি ইনে কতা- গিন কওদে
তুই আর একান্ত আর।
খতাগিন তোয়ার কি মনদ নাই।
তোয়ার বুকের আসমানত কি
মেঘ ন জমে ?
হালি হালি আই তোয়ার লাই
মরি কিলাই ।
আই ন- জানি - আই হাগল হইগিদে।
তুয়ি ন- বুজো ?
কিলাই গোস্বা হওদে কন কতাতন
বুজাই কওনা দে।
নিশিত রাইত তোয়ারে আই আসমানের
ঝিক মিক তারার
মইদ্দে খুজিদে
তোয়ার ঠান্ডা, ঠান্ডা হীম ভাব আই
বেয়াইন্না বেলার ঘাসত খুজিদে
তোয়ার উমভাব বৈশাখের রুদ্রছায়াত খুজিদে
ও আর রসিয়া বন্ধু আরে একলা রাহি
কডে গেলা ? কথা কওনা দে
আঁই চোখের হানিতে দরিয়া হইদ্দে
আঁই ন- জানি।

(২)

তোমার বুকের আকাশ মেঘ শূণ্য?

তোমার জন্য আমার অন্তর ফেটে যায়।
তুমি কেন বুঝ না।
যে দিন তোমার বুকের অরণ্যে মুখ
রেখে বলেছিলে তুমি আমার
শুধুই আমার।
সে সব কথা বুঝি তোমার মনে পড়ে না ?
রাগ করেছো কোন কথায়
প্রিয়ে বুঝিয়ে বলোনা গো !
তোমার স্মৃতি খুজি নীশিথের তারার মাঝে

তোমার হীম শীতল ভাব খুজি
ভোরের শিশিরে।
আর উষ্ণতা অনুভব করি
বৈশাখের রুদ্র ছায়ায়।
আমার প্রিয়তম ! আমাকে একা রেখে
কোথায় চলে গেলে ?
কথা বল, কথা বল
আমি চোখে জলে সাগর হই
তোমার বুক কি মরুভূমি ?
আমি জানি নে।

সমাপ্ত